মেয়েটির গল্প

অসীম ত্রিবেদী

শ্রাবণীর গল্পটা ঠিক যেন বিদ্যুৎ চমক আর বর্ষার মতই সাধারণ গল্প। আর সে গল্পটাই বলছিল একজনকে, সেই একজন আরেকজনকে তারপরে অন্য একজনকেও...

তারপর?

তারপর, ধরো, অন্যকেউ হলে তো দমেই যেত। কিন্তু আমি—শ্রাবণী—মনে মনে ঠিকই করে ফেললাম, এ মেয়েকে এত সহজে আমি ছাড়ছি না। আর ছাড়বই বা কেন বলো?

অমন একখানা মেয়ে, একখানা লক্ষ্মী মেয়ে! যেমন বুদ্ধি, তেমনি ভাষার শান! আমি ছেড়ে দেব? একটা ক্লাসের, মানে একটা সেকশানের—বিশেষ করে সেটা যদি 'সি' সেকশান হয়—তাহলে তার পঞ্চাশ-পঞ্চান্নটা মেয়েদের একেকটাকে তৈরি করতে কী পরিমাণ যে খাটা-খাটনি করতে হয়, একেবারে জান বাজি রেখে লড়ে যেতে হয়—সেটা তোমরা বুঝবে না, ক্লাস-টিচার ছাড়া কারো পক্ষেই বোঝা সম্ভবও নয়।

....কথা প্রসঙ্গে তোমাকে একটা অন্য ঘটনা বলি। বছর পাঁচেক আগের ঘটনা এটা। মেয়েটার নাম ছিল কেকা—কেকা দাস। এইট থেকে নাইনে উঠতে টায়েটোয়ে পাশ করেছে—একমাত্র তোমার ওই বাংলায় পেয়েছিল বাহান্ন। তা অমন রেজাল্ট করে নাইনে উঠলে তো, ধরো, সি সেকশান ছাড়া কোথাও ঠাঁই হবেই না। আর হবি হ, আমি সেই বছরই ক্লাস নাইনের ক্লাস-টিচার হলাম।

সেই থেকে এখনো, এবছর নিয়ে সাতবছর হয়ে গেল আমি ক্লাশ নাইনে ক্লাস-টিচার। তো হ্যাঁ কেকা, বুঝলে, কেকার সঙ্গে প্রথম ক'দিন কথা বলেই বুঝলাম যে ওর অসাধারণ ট্যালেন্ট রয়েছে। লেখা-টেখা সব সময়ই সাধারণের বেশ উপরে। তখন আমি আস্তে আস্তে জানতে চেষ্টা করলাম কি এই মেয়ে টায়েটোয়ে পাশ করে আসছে বছর বছর—ব্যাপারখানা কী?

ক্লাস শুরু হবার দু-তিনমাস বাদ থেকে ওকে বাড়িতে আসতে বললাম শনি-রোববার করে, কেননা, ওর আলাদা কোচিং দরকার। তো, এই আসা-যাওয়া চলতে চলতেই জানা গেল যে, কেকার মা মারা গেছেন ও মেয়ে যখন ক্লাস সিক্সের শেষ দিকে তখনই। অ্যাকচুয়ালি, ওর মায়ের মৃত্যুটা ছিল খানিকটা বাধ্যতামূলক মৃত্যু।

বাধ্যতামূলক মৃত্যু মানে?

মানে, স্বেচ্ছা জীবনদান শিবির আর কি! এ ব্যাপারটাতো ঘরে ঘরে চলছে বরাবর। ধরো, না খেয়েখেয়ে, না খেয়েখেয়ে আর ক্রমাগত অ্যাবরশান্ করিয়ে করিয়ে পেটের ভেতরের সবকিছু এমন ওলটপালট, এমন শুকিয়ে ফেলেছিল কেকার মা যে, হাসপাতালে দেওয়ার পর সাত সাতটা দিনেও ডাক্তার না রক্তবমি, না রক্তস্রাব, কোনওটাই বন্ধ করতে পারেনি।

আসলে কেকার বাবা কেকার মাকে মুখের পথ আর সৃষ্টির পথ—দু-পথেই একেবারে মেরে রেখেছিল। মায়ের মৃত্যুর বছর দেড়েক পর কেকা যখন ক্লাস এইটের প্রায় মাঝখানে তখন ওর বাবা বাড়িতে অফিসের এক বিধবাকে এনে তোলে। তাইতে মেয়েটা ছোটভাই আর বুড়ি ঠাকুমাকে নিয়ে এমনভাবে ভেঙে পড়ে যে—

কেন, এতে ভেঙে পড়ার কি আছে? ওর বাবা—আই মীন্—ওদের ক্লাসের বাবারা তো আরেকখানা বিয়ে করতেই পারে।

তাতো পারেই। কিন্তু, ওদের ক্লাসের টিচারের তাতে কষ্ট হয়। আসলে সেই বাবার অফিসের বিধবা ওদের সংসারে এসেই অত গুষ্টি-পগ্যের রান্না-ফান্না করতে পারবেনা বলে আমার এইটে পড়া মেয়েটাকে তার ঠাক্‌মা আর ছোটভাইয়ের সঙ্গে একঘরে গুঁজে দেয়। মাস পয়লায় কেকার বাবা কিছু টাকা দেয়—এ বাদে কেকা ক্লাশ ওয়ানের তিনটে বাচ্চা পড়িয়ে কিছু পায়; তাই দিয়ে কোনরকমে তিনটে প্রাণী টিকে আছে টিমটিম করে।

কেকা বলেছিল, ঠাক্‌মাটা নাকি পুরো কুঁজো একেবারে, সোজা হতেই পারে না। বাজার-দোকান, রেশন-কেরোসিন, ডাক্তার-বদ্যি, সব কেকাকেই করতে হয়।

তা, আমি বুঝলে, আমি এ সমস্ত বৃত্তান্ত জানছি আর ভেতরে ভেতরে শক্ত হচ্ছি। কী একটা যেন হল আমার। একটুও যেন সহানুভূতি এলনা কেকার বৃত্তান্ত শুনে। আমি খুব কেটে কেটে সে মেয়েকে স্পষ্ট বললাম, দ্যাখ মেয়ে, বাবা কেন বাবা নেই, এই ভাবনা ভেবে ভেবে নিজের জীবনটাকে বরবাদ করার কোন মানে হয় না। তোরতো কপাল ভাল যে, একটা ঠাকুমা পেয়েছিস। ঠাকুমা-দিদিমার মানে জানিস? ঠাকুমা-দিদিমা যদি ভালো জোটে তাহলে বাপ-মা দুজনে মিলে যা দিতে পারে, একা একজন ঠাকুমা কি দিদিমা তার অনেক বেশি দিতে পারে। এই জন্যেই দিদিমা আর ঠাকুমার গল্পের ঝুলি হয়—সে ঝুলিতে হার-না-মানা রাজপুত্তুর থাকে, বাপ-মায়ের এসমস্ত হয়না। অবশ্য তোর ঠাকুমাটা—

ঠাক্‌মা বড্ড মুখ খিস্তি করে।

তাহলে ঠাকুমাকেই ভাল কর। তোর কাজে লাগবে। বাবার জীবন বাবার, যা পারে করুকগে বাবা। তোর জীবন কিন্তু খালি তোর, বরবাদ হয়ে গেলে বাবার কিচ্ছুটি আসবে যাবে না। তাছাড়া তোর বাবাতো তোর জীবন বরবাদ করার রাস্তাই খুলেছে। এখন চ্যালেঞ্জ নিয়ে তোর বাবাকে হারিয়ে দে। লুকিয়ে বাবার জন্যে কেঁদে কেঁদে হেরো হয়ে গেলে—বাবাতো কলা দেখিয়েছেই, জীবনও বুড়ো আঙুল দেখাবে।

এই অবধি বলে শ্রাবণী উঠে গেল। একখানা ঝাঁকড়া বকুল গাছের কাছে গেল। আমি দূর থেকেও যেন চাপাকল থেকে ওর জল খাওয়ার ঢকঢক শব্দ শুনতে পাই। বোধহয় কেকা নামের মেয়েটার গল্প বলতে বলতে খুব তেতে গিয়েছিল। তাই বাইরে থেকে জল নিয়ে ভেতরের তাত্ কমায়। আমি দূর থেকে শ্রাবণীর বাসন্তী রঙের শাড়ি দেখি। লম্বা ছিপছিপে বাসন্তী রঙের একটা শিখা দেখি যেন।

তারপর?

শ্রাবণী বসতে বসতে প্রশান্ত হেসে বলে, বড্ড তেষ্টা পেয়েছিল,

তুমি রেগে গিয়েছিলে শ্রাবণী।

রাগ হবে না বলো? অমন ট্যালেন্টেড্ মেয়ে। তা যাইহোক, জানো, আমার কথায় বোধহয় কাজ হল। কেকা আস্তে আস্তে নিজেকে গুছিয়ে নিতে থাকল। সেবার নাইনের তিনটে পরীক্ষাতেই বেশ ভাল রেজাল্ট করল। আমার এত ভাল লাগে তখন, কী বলবো! একটা অখন্ড গীতবিতান আর একখানা পেন সকলের চোখের আড়ালে ওকে দিলাম। খুশি হলে মেয়েটা কেঁদে ফেলত জানো।

সে তো প্রায় সকলেই কাঁদে। খুশির বসন্ত, কিংবা বর্ষাও বলতে পারো, মানুষ সইতে পারে না। চোখই একমাত্র খোলা জায়গা যেখানে দিয়ে ভেতরের সঞ্চয়ের খানিকটা উপচে পড়তে পারে।

আরে বাহ্! দারুণ ব্যাখ্যা করলে। কিন্তু মশাই, আনন্দ না উপচিয়ে, কান্না উপচোয় কেন?

কি জানো, সব আনন্দই বোধহয় অশ্রুগর্ভজাত। কিংবা অন্যরকমও হতে পারে। হয়ত সমস্ত আনন্দ নিঙড়োলেই ফোঁটা ফোঁটা বেদনা পেয়ে যাবে।

হতে পারে, হতেই পারে। তো, বইটা আর পেনটা পেয়ে কেকা কেঁদেছিল খুব আমার ঘরে। গ্রিলবন্দী আকাশের পাশে। কোন এক রোববারের সকালে, আমি আলতো আদরে বলি,

আরে কাঁদিস কেন বোকা?

মা-র কথা মনে পড়ছে।

বোঝ কথা। মানুষের কখন যে কী মনে পড়ে, কাকে যে মনে পড়ে!

আমি বলি, মায়ের কথা মনে করার জন্যে সারাজীবন পড়ে রয়েছে, এখন ভালমত পড়াশোনা করোগে, মাধ্যমিকে যেন কিছু একটা দেখতে পাই, তা, মাধ্যমিকের আগের পরীক্ষাগুলোয় রেজাল্টতো ভাল করলই কেকা, ফাইনালে একেবারে মাত্ করে দিল। তিন তিনটে লেটার পেল। আমার বাংলা আর ইংরেজীর দুটোতেই লেটার, আর পেল জীবনবিজ্ঞানে। ওর ওই রেজাল্ট দেখে আমার সে কী কান্না। আমি যত কাঁদি, কেকাও তত কাঁদে, কেমন হাসতে হাসতে কাঁদি আমরা মেয়েরা, না? যেন বর্ষার আকাশ। আসলে আমরা মেয়েরা সবকাজই বড় বেশি হৃদয় দিয়ে—

ভাল না শ্রাবণী, খুব বিপদের কথা।

কোনটা?

এই যে এত এত হৃদয়ের অপচয়... ভয় হয় শ্রাবণী, হৃদয়ের বাড়াবাড়িই অহেতুক হত্যাকান্ডের প্রাক্‌শর্ত কিনা, তা ভাবি। যাইহোক, বলো, সেই কেকার কথা বলো।

হ্যাঁ সেই কেকা এখন ইংরেজীতে এম. এ. করছে। টিউশানি পড়িয়ে নিজেদের খরচ-খরচা চালায়। ওর কুঁজো ঠাকুমা বুড়ি এখনো বেঁচে থেকে কেকার ঘরের দিকটা সামলায়।

আর ওর বাবা।

বাবার সেই বিধবা বৌ পালিয়ে গেছে। আর বাবাও কোথায় যেন হারিয়ে গেছে দ্যাখো, কেকার বাবা হারিয়ে গেলে আমার কিছু যায় আসেনা। কিন্তু কেকারা হেরে গেলে আমি হেরো হয়ে যাবো। কেকার এম. এ.-তে ভাল রেজাল্ট চাই-ই।

তারপর?

তারপর আমার সুপ্তিতো রয়েইছে। সুপ্তি হাঁসদা। নিবাস সাঁওতালপাড়া।

ওহো, সেই সুপ্তি, যার পিছু নিয়েছিলে তুমি, যার কথা বলতে গিয়ে কেকার কথা চলে এল।

হ্যাঁ, সুপ্তি—সুপ্তি হাঁসদা। জানতো, কী সাহস সে মেয়ের। একেতো পড়া করেনি, তায় যেম্নি না জিগ্যেস করেছি, কিরে নাইনে উঠেছিস, এখন পড়বিনাতো কবে পড়বি রে?

মেয়ে আমার মুখে মুখে চোপা করে বলে কি জানো, কী করে পড়ে লিব দিদিমণি? আমার পড়াশুনার টেইম্ নাই।

কেন?

চুপ করে থাকে। আর, আমি তো নিজে মেয়ে, বুঝি কোনও লজ্জা আছে। ও বলতে পারছেনা, তাই তখনকার মত পিছু হটে যাই। পরে টিফিন পিরিয়ডে ওকে নিয়ে স্কুলের ছাদে পায়চারি করতে করতে খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করে জানতে পারি, ওর কেন পড়ার সময় নেই।

ওর নতুন ভাই হয়েছে সবে তিনমাস হল। একখানা মোটে ঘর। তার মাঝখানে দড়িতে শাড়ি টাঙিয়ে একধারে ওর মা, বাবা আর তিনমাসের ভাইয়ের শোওয়ার জায়গা, অন্যধারে সুপ্তি হাঁসদা তার বাকি দুই বোনকে নিয়ে শোয়।

আচ্ছা, তাহলে শ্রাবণী বোঝা গেল যে, সুপ্তির বাবা-মাকে ছেলের নেশা পেয়ে বসেছিল।

তা নাও হতে পারে জানো। হয়ত দ্বিতীয় সন্তানটা ছেলে জন্মে গেলেও ওরা আবার সন্তান আনত—মেয়ে কি ছেলে, যাইহোক, আনতোই।

তা হয়ত আনতো। তবে ছেলে আনতেই চাইত। যাই হোক, বলো সুপ্তি হাঁসদার কথা।

সুপ্তিকেই রান্নাবান্না সমস্ত করতে হত। রেশন-দোকান করতে হত। ওর বাবা একখানা

লজঝড়ে রিকশাভ্যান নিয়ে সকালে বেরিয়ে যেত, ফিরত মাঝরাতে। তখন মাতাল থাকত। তার মানে, চিৎকার, চেঁচামেচি, খিস্তি, বলাৎকার—সব শুনতো ওইটুকু মেয়ে।

মানে, তোমার নাইন সি-র সুপ্তি।

হ্যাঁ সুপ্তি—সুপ্তি হাঁসদা।

ওদের বাড়ি কোথায় ছিল শ্রাবণী?

ওইতো, স্টেশনের পুবদিকে অনেক অনেক দূরের সেই সাঁওতালপাড়ায়। প্রাচীন, খুবই প্রাচীন পল্লী।

সে তো অনেক দূর শ্রাবণী!

অনেকদূর মানে, এত দূর যে, ভয় করে।

ওখানে থেকে স্কুলে আসত কি করে?

কেন, পায়ে হেঁটে।

হেঁটে? আর ওই বর্ষাকালে?

কামাই করত খুব। অত কামাই করত বলেই পড়াটড়া ধরতে পারত না। তখন বকাঝকা করলে বলত, আমার পড়ার সময় নাই। ইস্কুলে আসবার সময় নাই। আজ আসিছি না খেয়ে, মার মুখখিস্তি খেয়ে।

আমি ভাবলাম একদিন ওর মায়ের সঙ্গে কথা বলব। ওকে বললামও সেকথা। আমার কথা শুনে সুপ্তি ব্যাধের দেখা পাওয়া পাখি হয়ে গেল। তারপর থেকে স্কুলেই আসে না মেয়ে। কোনরকমে সেকেন্ডটার্ম পরীক্ষাটা দেয়। পরীক্ষার পর আর আসেনা। তখন আমি খুঁজে খুঁজে সাঁওতাল পাড়ার দুটো ছাত্রী পেলাম সেভেন সি-তে। তাদের মারফৎ চিঠি পাঠালে সে মেয়ে দুদিন পর এল স্কুলে।

এল তাহলে?

হ্যাঁ এল। তবে বড্ড ঠ্যাটা টাইপের মেয়ে। টিফিন পিরিয়ডে ওকে নিয়ে স্কুলের ছাদে গেলাম। কিন্তু কি জানো, যাকে তাকে নিয়ে ছাদে গেলে তো আকাশ পাওয়া যায় না। মেয়েটা এমন সমস্ত কথা বলল, মনে হল হু হু মরুভূমিতে দাঁড়িয়ে আছি।

বললাম, ব্যাপারটা কী? তুই এতভালো বাংলা লিখিস, অংকের কল্যাণীদি বলছিল তুই নাকি চ্যাম্পিয়নের মত অংক করিস, তা তোর এত রেজাল্ট খারাপ কেন? এই এত এত কামাই-ই বা করবি কেন? তোকে বড় হতে হবে মা। নইলে তোকেও তোর মা হয়ে যেতে হবে যে সোনা আমার।

মেয়ের সেই একই কথা। এক ঘ্যানঘ্যানানি। কি না ওর আবার একটা ভাই কি বুন হবে, মায়ের এমন অবস্থা। ওর ইতিহাস বই নেই। কার কাছ থেকে নাকি চেয়ে বইয়ের অর্ধেকটা খাতায় লিখে নিয়েছে। ওর স্কুলের আসার শাড়ি নাকি মা পরে বসে থাকে। ওর খাতা ছিঁড়ে মা ঠোঙা বানিয়েছে।

কি জানো এই সমস্ত সাতকাহনে মন গলে গেলে আর ক্লাসটিচার হওয়া যায় না। সুপ্তি

যখন শেষ কথা মানে, আমি আর পড়তে পারবনা দিদি— বলে ছাদ ছেড়ে, আকাশ ছেড়ে, আমাকে একলা ফেলে রেখে আবছায়া সিঁড়িতে নেমে গেল তখন মনে মনে ঠিক করলাম এব্যাপারের একটা হেস্তনেস্ত করেই ছাড়ব। সোজা গেলাম লাইব্রেরীতে, তারপর টিচারদের কাছে। ইতিহাস, জীবনবিজ্ঞান, বাংলা নোটবুক ব্যাগে নিয়ে রাখলাম। বাহাদুরকে দিয়ে কয়েকখানা বাঁধানো খাতা কিনিয়ে এনে ব্যাগে পুরলাম। তারপর স্কুল ছুটি হবার পর ওর পিছু নিলাম।

তারপর?

স্কুল ছুটির অন্তত দশমিনিট পর রিকশা নিয়ে খালধারের সাঁওতাল পাড়ার দিকে রওনা হই। রিকশাওলা কিছুতেই তাড়াতাড়ি যেতে পারে না বেচারি, রাস্তার যা হাল হয়ে আছে।

শ্রাবণী পথের হাল তো এরকমই হবে। স্বাধীনতা বুড়ো হয়েছে না!

যা বলেছ! তা যাইহোক, রিকশা রেলগেট পেরিয়ে রবীন্দ্রনগর এ-ব্লক, তারপর এল বি-ব্লক—বি ব্লক পেরিয়ে খালপাড়ের রাস্তা ধরল, সে রাস্তা ডানদিকে আকাশমুখো হতেই দেখি, আকাশের গায়ে ওই আমার লালপাড়-সাদা শাড়ি সোজা হেঁটে যাচ্ছে। সামনে ধু ধু প্রান্তর। রাস্তাও শেষ।

প্রান্তরের মুখোমুখি হয়ে আমি থমকে গেলাম। রিকশাওলা বলে, আর তো রাস্তা নেই দিদি। আপনারে মাঠখানি পাড়াইতে লাগব। আমি টাকা পয়সা মিটিয়ে রিকশা ছেড়ে সেই তেপান্তর সাইজের মাঠে পা রেখে প্রায় দৌড় লাগালাম। ধু ধু মাঠখানা বোবা হয়ে পড়ে আছে জানো। ইলেভেন সাইডের অন্তত চার দুগুণে আটটা দল খেলতে পারে এমন প্রান্তরের এককোণে কতকগুলো বাচ্চাছেলে খানিক বালখিল্যতা করছে।

শহর ছেড়ে এসেছি, রেললাইন পেরিয়ে এসে লোকালয়ও শেষ হল যেন প্রান্তরের কিনারে। মনে স্বাভাবিক প্রশ্ন জাগে, এরপরও লোকালয় হয়? এমন কথা ভাবতে ভাবতে মাঠ পেরোচ্ছি যখন তখন দেখি মাঠ আর আকাশের রেখা বরাবর ওই হেঁটে যাচ্ছে আমার লাল পাড় সাদা শাড়ির মেয়ে। আমি সেই তেপান্তরকে কোনাকুনি চিরে বেরোতে চাইলাম, নাহলে ওই প্রান্তরে সুপ্তিকে আমি ধরতে পারবনা।

তাই কোনাকুনি ছুটছি তখন। ছুটতে ছুটতে হাঁফাতে হাঁফাতে এপ্রান্তে এসে অবাক! অবাক চোখে দেখি প্রান্তরের শেষে সোজা রাস্তা ভেঙে কাঁড়ি কাঁড়ি এত ছোট ছোট রাস্তা বেরিয়েছে যে, আমি যেন বাঘবন্দির ছকের মুখে দাঁড়িয়ে। সত্যি, এখানেও তাহলে লোকের আলয় আছে। এমন সমস্ত আলয়? কি ছিরি! এই সমস্ত আলয়ের গলিপথে ঠিক কোন্ আলয়ে আমার সুপ্তি হারিয়ে গেছে ভেবে তল পাইনা। কিন্তু আমি তো ছাড়বার পাত্রী নই। পা রাখলাম সেই জটিল বাঘবন্দির ছকে।

তারপর?

তারপর আর কি, শ্রাবণী হারিয়ে গেল। আর ফিরে এলনা।

হারিয়ে গেল মানে? কোথায় হারালো?

কেন, শহর, রেললাইন, লোকালয়, তেপান্তর সমস্ত পেরিয়ে দিগন্ত রেখায়, সাঁওতাল পাড়ায়।

কেন হারালো?

সে কথা কোনও ক্লাসটিচার জানে, আমি তার কি জানি?

তাহলে আপনাকে কেকা-সুপ্তির কথা বললটা কে?

কেন, শ্রাবণী নিজেই। এই স্টেশনেই। অনেকদিন আগে।

আর সে যে হারিয়ে গেলো, তা জানলেন কোথায়?

এই স্টেশনেই। হঠাৎ। কাঁধে ঢাউস ব্যাগ একখানা। হাতে সুপ্তির হাত ধরা। আমি ডেকে বলি, আরে শ্রাবণী যে! কোথায় যাচ্ছো? অনেক কাল পর?

আমি যাচ্ছি না। সেই সুপ্তি যাচ্ছে।

কোথায় যাচ্ছে সুপ্তি?

জানতে পারলাম যে, হায়ার সেকেন্ডারি পাশ সুপ্তি টিচার্স ট্রেনিং নিয়ে একটা প্রাইমারি স্কুলের ক্লাসটিচার হয়েছে, আরও জানলাম যে সাঁওতালপল্লীতে এখন আশপাশের গ্রামের ছেলে মেয়েরাও শ্রাবণীর কাছে পড়তে আসে। ফ্রি পড়ানো। শ্রাবণী সাঁওতাল পাড়ায় থাকে। আরও কিছু জানার আগে ট্রেন আসে, ভিড় আসে, শ্রাবণী আবারও হারায়। আমাকে একবার বলেও যায় না যে, আসি।

তারপর?

তার আর পর কোথায়?

আছে। গেরুয়া পাঞ্জাবি পরা লেখক উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলে, যদি অনুমতি দেন তাহলে আমি শ্রাবণীর গল্পটা লিখি। লিখে ছাপতে দিই।

বাহ! এতো ভাল কথা। লেখো। তোমার পাঞ্জাবীর গেরুয়া রঙটুকু মিশিয়ে লিখো!

তাহলে শ্রাবণীর কথা লেখা হল?

হ্যাঁ লেখা হল। ছাপা হল। পড়া হল। লেখকেরও নাম হল।

তারপর?

আবার কি?

না মানে, লেখক শুধু লিখলো, কিছু করল না?

হ্যাঁ জানো, লেখকও শ্রাবণীর মত হারিয়ে গেল।

শ্রাবণীর কাছেই গেল কি লেখক? কেন হারায়?

কে জানে, কোন ক্লাসটিচার হয়ত বলতে পারবে, আমি তো জানি না।

আচ্ছা, ক্লাসটিচার শ্রাবণী আর লেখক ঠিক কেমন?

ধরো, একজন বাসন্তী রঙের শিখা, অন্যজন গেরুয়া একটা পথ।